দরবারী-কানাড়া

অরিন্দম নাথ

মেঘনাদবাবু যে মহল্লায় থাকেন সেখানে প্রচুর কুকুরের বাস। অধিকাংশ শ্বাপদেরাই একসময় পথ-শিশু ছিল। মেঘনাদবাবুর নিজেরও একটি কুকুর আছে। বাঘা স্বদেশীয় গোষ্ঠীভুক্ত। এত-সমস্ত চতুষ্পদের সমাবেশের দরুন সবসময়ই সাম-গান লেগে থাকে। মেঘনাদবাবু যখন বাঘাকে নিয়ে সকালে বেড়াতে যান, অনেক স্বগোত্রয়ীই নিজ নিজ ভঙ্গিতে তার সাথে আলাপ করে। এর মধ্যেও প্রকার ভেদ আছে। খুব ভোরে কিংবা কীর্ত্তণ অথবা উৎসবের দিনগুলিতে আলাপন একটু খাদে থাকে। বিপরীত লিঙ্গভূক্ত অনেকেই প্রেম নিবেদন করতে চায়। মেঘনাদবাবু মনে মনে এই প্রতিক্রিয়াগুলিকে একটি সূত্রে বাঁধার চেষ্টা করেন। তবে তাঁর জানা ছিল না, অনেক আগেই বৈদিক যুগেই এইসব নিয়ে মুনি ঋষিরা গবেষণা করে সূত্রে বেঁধে গেছেন৷

সেই সূত্র বলার আগে, মেঘনাদবাবু রেকটি অভিব্যক্তির কথা বলি। মাঝে-মাঝে গভীর রাত্রিতে বস্তি-খেঁকীদের আস্ফালনে মেঘনাদবাবুর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তখন তাঁর মনে আসে একটি ছড়া :

প্রথম প্রহরে প্রভু ঢেঁকি অবতার,
দ্বিতীয় প্রহরে প্রভু ধনুষ্টঙ্কার।
তৃতীয় প্রহরে প্রভু কুকুর কামড়ানি,

চতুর্থ প্রহরে প্রভু দেন গড়াগড়ি।

মেঘনাদবাবু ছড়াটি জীবনে একবারই শুনেছিলেন, তাঁর এক অধ্যাপকের মুখে। সেই থেকে আর ভুলেন নি । যদিও সেই অধ্যাপক অনেকদিন হল গত হয়েছেন । মেঘনাদবাবুর বর্তমান বয়স, শিক্ষক মশাইয়ের তৎকালীন বয়সের কাছাকাছি । ছড়াটিতে আসলে মানুষের ঘুমের চারটি পর্যায় বর্ণনা করা হয়েছে। মেঘনাদবাবুর রাগ সঙ্গীত সম্পর্কে কোন ধারণা নেই । কুকুরদের এই আলাপনকে মেঘনাদবাবু নিজে থেকেই একটি নাম দিয়েছেন, দরবারী-কানাড়া।

সম্প্রতি মেঘনাদবাবু উত্তর-পশ্চিম ভারতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তিনি যেখানে ছিলেন, তার আশপাশে প্রচুর ময়ূরের বাস। ভোরের আলোতে ময়ূরের পেখমের বিন্যাস প্রাণভরে উপভোগ করেছেন। কিন্তু কেকারব একদম ভালো লাগে নি। ভীষণ কর্কশ শোনায়। সেই কেকাধ্বনি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। সেদিন বাঘাসহ প্রাতঃভ্রমণের সময় আবার মনে এলো। বাঘাকে দেখে একটি সফেদ রঙের ছাগল প্রায় কেকারব করে উঠল। পরবর্তী কয়েকদিন মেঘনাদবাবু আমাদের রাগ সঙ্গীত, দরবারী-কানাড়া এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়েই ব্যস্ত রইলেন।

তিনি এই জেনে অবাক হন যে ভারতবর্ষে সঙ্গীতের উৎপত্তি কোন কালে এবং কি ভাবে হয়েছে, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত কিছু জানি না। প্রচলিত কিংবদন্তী, দেবতারা সঙ্গীতের স্রষ্টা। অনেকে বিশ্বাস করেন, আদিম কালে সুর তৈরি হয়েছিল পাখির মধুর স্বর নকল করে। তখন শিকারিরা পাখির ডাক নকল করে পাখিকে ফাঁদে ফেলত । শিকার করার জন্য। তবে পাখির ডাক আর গানে কিছু তফাত আছে। তিনি সম্প্রতি যে কেকা শোনে এসেছেন, তা আসলে ময়ূরের ডাক । একটানা লম্বা স্বরকে বলা হয় পাখির গান । অবশ্য সেটা ময়ূরের গানও হতে পারে, কারণ সব পাখি কোকিলকণ্ঠী নয় । কোকিলের ডাকে চার-পাঁচ রকম স্বর থাকে । পাখির গান সবচেয়ে মিষ্টি হয়, যখন সে সঙ্গিনী খোঁজে। পাখিদের মধ্যে সাধারণত সঙ্গীত বিশারদ হয় পুরুষ পাখিটি।

আদিকাল থেকে খ্রীষ্টপুর্ব দশম শতকের মধ্যে "বেদ" রচিত হয়। চার বেদের মধ্যে সামবেদ সঙ্গীতময়। সামবেদের মন্ত্রগুলি সুর করে গাওয়া হয়। তাই একে বলা হয় সামগান। সামগানে তিন প্রকারের স্বর ব্যবহার হয় -স্বরিত, উদাত্ত এবং অনুদাত্ত। উদাত্ত উঁচু স্বর, অনুদাত্ত নীচু। স্বরিত মাঝামাঝি। প্রথম অবস্থায় -সা , রে ,গা এই তিনটি নোট দিয়েই কাজ চলে যেত। ক্রমে প্রাচীন ঋষিরা দেখলেন যে এই তিনটি নোট দিয়ে কাজ চলছে না। তাঁরা প্রকৃতিকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন। বিভিন্ন পশুপাখির আওয়াজ শুনে সাতটি নোট তৈরি করলেন। যথাক্রমে, সাদ্জা (সা),রিশাভা (রি),গান্ধারা (গা),মধ্যমা (মা),পঞ্চম (পা),ধাইবাতা (ধা),নিশাধ (নি)।

সাদ্জা (সা) এসেছিল ময়ুর এর ডাক থেকে।
রিশাভা (রি)এসেছিল বুলবুল এর ডাক থেকে।
গান্ধারা (গা)এসেছিল ছাগল এর ডাক থেকে।
মধ্যমা (মা)এসেছিল বক এর ডাক থেকে।
পঞ্চম (পা)এসেছিল কোকিল এর ডাক থেকে।
ধাইবাতা (ধা)এসেছিল ঘোড়া এর ডাক থেকে।
নিশাধ (নি)এসেছিল হাতি এর ডাক থেকে।

এরপর এই সাতটি বেসিক নোট থেকে জন্ম নেয় আরো পাঁচটি উপ-নোট। বারটি নোটের মিশ্রণে জন্ম নেয় মোট ৭২ টি রাগ। তারপর প্রতিটি রাগকে ৪৮৩ টি উপরাগে ভেঙ্গে ফেলা হয়। ফলে মোট ৪৮৩ x ৭২ = ৩৪৭৭৬ রকমের সঙ্গীত তৈরি হলো। এভাবেই জন্ম হলো ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের। আধুনিক যেকোনো বাদ্য যন্ত্রের বাজানাই এই ৩৪৭৭৬ বিন্যাসের বাইরে যাবে না।

বর্তমানে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রধান দুটি ধারা রয়েছে -

- হিন্দুস্তানী সঙ্গীত এবং
- কর্ণাটকী সঙ্গীত।

হিন্দুস্তানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রচলন মূলতঃ উত্তর ভারতে। কর্ণাটকী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত মূলতঃ দক্ষিণ ভারতে। হিন্দুস্তানী সঙ্গীতের চর্চা বৈদিক যুগে শুরু হলেও মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে এই সঙ্গীতের প্রভূত প্রসার ঘটে। এর উপর ফার্সী প্রভাব পড়ে। কর্ণাটকী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বা কর্ণাটকী সঙ্গীত হচ্ছে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আদিতম রূপ।এই সঙ্গীত দক্ষিণ ভারত থেকে সৃষ্ট।

মোগল সম্রাট আকবরের দরবারে নায়ক বৈজু, তানতরঙ্গ, গোপাল, তানসেন প্রমুখ ছত্রিশজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে তানসেন ছিলেন মুখ্য। তিনি দরবারী কানাড়া, মিঞা-কি-সারং, মিঞা-কি-মল্হার, মিঞা-কি-তোড়ী, দীপক প্রভৃতি রাগ রচনা করেন। দরবারী-কানাড়া উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত।এইটি গম্ভীর প্রকৃতির রাগ। গভীর রাত্রিতে গীত হয়। তবে তানসেন হয়তো কুকুরদের শয়েস্তা করতে একটি তেজী রাগ দীপকের সৃষ্টি করেছিলেন। কথিত আছে এই রাগ যা গাইলে গান থেকে আগুন সৃষ্ট হত। আর সেই আগুনে আশপাশের রাস্তার কুকুর পর্যন্ত মরে যেত। অনেক সময়ই তানসেনের শরীর ঝলসে যাবার মত সম্ভাবনা হতো।